সংগীত-সাহচর্যে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ

গৌরব চৌধুরী

ঠাকুর-বাড়ির বিচিত্র-বিস্ময় 'ওবিন ঠাকুর' — তাঁকে কে না চেনেন। কত-না বৈচিত্রময় লেখায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। সেই লেখাগুলি নাটকের সংলাপে থাকুক, হাসির বা লোক-ঐতিহ্যের উপাদান সমন্বিত রচনায় হোক বা ছবির লেখক রূপেই হোক — আজও বিরল দৃষ্টান্ত। একদিকে তিনি যেমন তাঁর সমগ্র জীবনে শিল্পচর্চার ঐতিহ্য ও ভারতীয় শিল্পরীতির পত্তন করেন, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যিক ও শিল্প প্রাবন্ধিক রূপে তাঁর প্রকাশ বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় রূপ বলে সম্মানিত। শিল্পের বিবিধ-রতনের স্নিগ্ধ-ঝিলিক অবনীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টির মধ্যে মেলে। তবে যে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে একটু কম আলোচিত হয়, তা হল অবন ঠাকুরের জীবনপটে আঁকা সুরধুনীর সুরের জাল-বোনার খেলা, অর্থাৎ ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায় ও তাঁর জীবনযাত্রায় সংগীতের সমান্তরাল গতি। এই প্রবন্ধে, সংগীত আলোচনায় অবনীন্দ্রনাথ শিরোনামটি হয়তো হতে পারত কিন্তু তাঁর জবানবন্দিতে বন্দি ঘটনাগুলি তো কথার বেড়া নয় বরং ঠাকুরবাড়ির অন্তরাত্মার আকুল ধারা। সে ধারা নৃত্য-গীত-বাদ্য ও নাট্যে পরিপূর্ণ হৃদয়-সংগীত।

অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় সংগীতচর্চা সম্পর্কে যে সুবিশাল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে তাকে আলোচনা ও কল্পনার সুবিধার্থে তিনটি স্তরে রাখা যেতে পারে। প্রথমত, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের সুর যেখানে বাল্যাবস্থা কেটেছে। দ্বিতীয়ত, নানা সংগীত জলসায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিজ্ঞতা এবং তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ও নাট্যাভিনেতা অবনীন্দ্রনাথ। এই তিন ধারা থাকলেও অবন ঠাকুরের এই স্মৃতিচারণে বারে বারে ধরা পড়েছে শতাব্দী প্রাচীন ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা ও চর্যার নান্দনিক রূপ। সেই রূপ একদিকে যেমন স্মৃতিমধুর তেমনি সংগীত গবেষকদের কাছেও বড় কাছের — কারণ এত তথ্য প্রাচুর্য খুব কমই মেলে। শুধু তাই নয় সেই দিনগুলির মধ্যে নৃত্যকলা দেখার সুযোগ ঠাকুর-পরিবারে ছিল। সেই

ফেলে আসা দিনের স্মৃতি বিজড়িত অভিজ্ঞতা যে পরবর্তীকালের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনার অঙ্কুর নয় সেটা কেই-বা বলতে পারেন।

ছোটবেলায় অবনীন্দ্রনাথের কানে একটি সুর লেগেছিল। সেই সুর ছিল নিস্তব্ধ গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালার ডাক আর সন্ধ্যায় 'বেলফুল, চাই বেলফুল' ডাকতে ডাকতে গলির পথ ধরে মালিদের চলে যাওয়া। এগুলি ছিল তাঁর শৈশব জীবনের জীবনের না-ভোলা পথের ডাক, যে ডাক শুনলে 'ঘরে থাকাই দায়'। চেতনার জগৎ জুড়ে থাকা সেই ফেরিওয়ালাদের ডাক প্রৌঢ় অবনীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান,

'বরিফ বরিফ' ব'লে
বরফওয়ালা যান।
গা ঢালো রে, নিশি আওয়ান
'বেল ফুল বেল ফুল'
ঘন হাঁকে মালীকূল — [১]

ঠাকুর-বাড়ির অন্দরে গান-বাজনার মহল সম্পর্কে কম-বেশি সকলেই জানেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সভাগায়ক। দুর্গাপূজোর আগমনীর গান, বিজয়ার গান ছিল বিশেষ আকর্ষণ। বাড়ির বৈঠকখানায় বসত 'ওস্তাদি গানের মজলিস'। পাড়াপড়শি ছাড়াও পারিবারিক আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব উপস্থিত হতেন মজলিশ শুনতে। সে মজলিস ভাঙত 'নটার তোপ'-এর প্রহর ঘোষণায়। এই মজলিসে ছোটদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে তেতলার ছাদে কাদম্বরী দেবীর ঘরে হত গানের আসর। সে আসরে গান গেয়ে যেতেন রবীন্দ্রনাথ আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করতেন পিয়ানোর সঙ্গত। সে যুগে গুরুদেবের কণ্ঠ সে যেমন সুর তেমনি গান। মাত করে দিতেন চার দিক। এ বাড়ি থেকে শুনতুম আমি কান পেতে। [২]

বাড়ির মেয়েদের মহলে রাত্রিবেলা বাড়ির দাসীরা একজোট হয়ে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করতেন। তাদের মধ্যে একজন দক্ষিণেশ্বর থেকে আসতেন, অবনীন্দ্রনাথ তার নাম বলেছেন 'আন্দিবুড়ি'। তিনি সৌদামিনী দেবী অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের শ্যামাসংগীত শোনাতে আসতেন। দেখতে ভালো ছিলেন না ঠিকই কিন্তু 'তার গলায় সুর ছিল চমৎকার'। একবার ছেলেবেলায় কোন্নগরে থাকাকালীন 'বাবামশাই' গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পরীক্ষা দিয়ে পেলেন 'মস্ত একটা বিলিতি অর্গ্যান বাজনা'। বুড়ো চাটুজ্জে মশাইয়ের কাছে প্রথম শিখলেন গান

হায় রে সাহেব বেলাকর
আমি গাই দোব, তুই বাছুর ধর্।
ওটি শিষ্ট বাছুর, গুঁতোয় নাকো
কান দুটো ওর মুচড়ে ধর্।
হায় রে সাহেব বেলাকর।। [৩]

এই ছড়ার গান কোন্নগরের স্থানীয় সংগীত বললেও ভুল হবে না। অবনীন্দ্রনাথ এই গানের উদ্ভব সম্পর্কে লেখেন,

> ব্ল্যাকইয়র সাহেব রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফেরবার সময় গয়লা বাড়ি গিয়ে গয়লানীর কাছে একপো করে দুধ খেতেন। পাড়ার লোকে এই দেখে তার নামে গান বেঁধেছিল। [৪]

ঠাকুরবাড়ির দেউড়ি রমরম করত 'আনন্দ-বসন্তসমাগমে'। রঙের রাগে, ঢোলের বোলে আর নাচের ছন্দে মেতে থাকত দোল উৎসব। সারাবছর যে ঢোলগুলি দেয়ালে থাকতো টাঙানো হোলির 'দু-চার দিন' আগে সেগুলো নামানো হত। তেল ও আরও কিছু লাগিয়ে পরিষ্কার করে, পালিশ করে সেগুলির জীর্ণ চেহারা দূর করা হত। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া লালসুতোয় বাঁধা ঢোলটি পৌঁছে দেওয়া হত বাড়ির বৈঠকখানায় আর 'দরোয়ানদের ঢোল থাকত দেউড়িতেই'। দোলের দিন ভোরবেলা থেকে সমস্ত ঢোল উঠত বেজে, যেন মন্দ্রমধুর নীরদ-গর্জন। গানও হত খঞ্জীরা বাজিয়ে বাজিয়ে। অবনঠাকুর বলেছেন, 'যেন চড়াই পাখি কিচির মিচির করছে'। দেউড়িতে যে নাচ হত তার বিবরণে বলেছেন

কোত্থেকে রাজপুতানী নিয়ে আসত, সে নাচত। বেশ ভদ্ররকমের নাচ। আমরাও দেখতুম। বেহারাদের নাচ হত, পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচত, সে কিরকম অদ্ভুত বীভৎস ভঙ্গি, দু-হাত তুলে দু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধেই ধেই নাচ আর ঐ এক খচমচ খচমচ। উড়েরাও নাচত সেদিন দক্ষিণের বাগানে লাঠি খেলতে খেলতে। বেশ লাগত। উড়েদের নাচ আরম্ভ হলেই আমরাও ছুটতুম 'চিতাবাড়ি' দেখতে। [৫]

দোল উৎসবে দেউড়ির অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানাতেও উৎসব পালিত হত কিন্তু সেখানে বালক অবনীন্দ্রনাথের যাবার হুকুম ছিল না। কিন্তু বালকমনের কৌতূহল তো দমে যাবার পাত্র না। ভিতরে যাবার জন্য হুকুম যখন নেই তখন উঁকি দেবার হুকুম আছে মনে করে সেই 'উঁকিঝুঁকি' দিয়েই দেখতেন,

আধ হাত উঁচু আবিরের ফরাস। তার উপরে পাতলা কাপড় বিছানো।

তলা থেকে লাল আভা ফুটে বের হচ্ছে। বন্ধুবান্ধব এসেছেন অনেক — অক্ষয়বাবু [অক্ষয় মজুমদার] তানপুরা হাতে বসে। শ্যামসুন্দরও আছেন।... সেবার এক নাচিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে নন্দ ফরাস এনে রাখলে মস্ত একটি আলোর ডুম। নাচিয়ে ডুমটি ঘুরে ঘুরে নেচে গেল। নাচ শেষ হল; পায়ের তলায় একটি আলপনার পদ্ম আঁকা। নাচের তালে তালে পায়ের আঙুল দিয়ে চাদরের নীচের আবির সরিয়ে সরিয়ে পায়ে পায়ে আলপনা কেটে দিলে। অদ্ভুত সে নাচ। [৬]

তবে দেউড়ির দোলেই মন ভরে থাকত বালক অবনীন্দ্রনাথের। তাঁর মনে হত তারা যেন রক্তের হোলি খেলতে জানে। বৈঠকখানায় হয় 'শখের দোল' যা শৌখিনতার চূড়ান্ত' কিন্তু দেউড়িতে যে দোল হয় সেখানে কৃত্রিমতা নেই। 'তারা মনের আনন্দে উৎসব করে, আনন্দে নাচে গায়, তাতে তারা মেতে যায়'। তবে ছেলেবেলায় গানের আনন্দ ঘিরে রাখতেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। দক্ষিণের বারান্দায় ছোট্ট সেতার হাতে তিনি গেয়ে যেতেন 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'পূণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ'। বাড়ির অন্যান্য ছোটদের সাথে তিনিও দু-হাত তুলে নেচে নেচে গাইতেন 'কোঽপি লভেৎ কোঽপি লভেৎ'।

ছেলেবেলায় আরেকবার নাচ গানের ব্যবস্থা হয়েছিল পলতার বাগানে। পলতার এই বাগান এক ঐতিহাসিক ক্ষেত্র। ১৮৪৫ সালের ৭ পৌষ পলতার গোরেটি বাগানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদের নিয়ে প্রথম উৎসব করেন। এটিই ছিল ব্রাহ্মদের নিয়ে প্রথম সামাজিক উৎসব। যাই হোক সেবারের উৎসব ব্রাহ্মোৎসব ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী [শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী, প্রতিমা দেবীর মাতা] বিনয়নী দেবীর বিবাহের জন্য জামাইষষ্ঠীর দিন পাত্র দেখা হবে এই উপলক্ষে গুণেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে পার্টি দেন। সেই আনন্দানুষ্ঠানে বৈঠকখানার পার্টিতে নাচ ও গান হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ আরও পরিবারের প্রণম্য ব্যক্তিত্ব। সেদিনের গায়ক ছিলেন স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু দ্বিতীয় দিনের রাত্রে আনন্দের হল অবসান। অকস্মাৎ 'কাল-জ্যৈষ্ঠ'র আগমনে পরলোকগমন করলেন পিতৃদেব গুণেন্দ্রনাথ। এই ঘটনার সাথেই অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল'।

যৌবনেও শিল্পের চর্চায় এতটুকু ভাঁটা পড়েনি অবনীন্দ্রনাথের। তবে এই চর্চা মূলত ছিল অন্তরের এক নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ। যাকে তিনি বলতেন 'ভিতরের শখ'। ছবি বা চিত্রশিল্পের পাশাপাশি সংগীতেও তাঁর

ছিল ততখানি আনন্দ। তাঁর ইচ্ছেও হয়েছিল বাজিয়ে হবার 'যাকে বলে ওস্তাদ'। শুরু করলেন এস্রাজ বাদন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সাথে এস্রাজ শিক্ষাগ্রহণ শুরু হল। গুরু 'ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরী'। এদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল বিলিতি বাদ্যযন্ত্রে। তাই তার কাছে এই যন্ত্রের সংগীত সাধনা খুব কঠিন বলে মনে হয়নি। কিছুদিনের অভ্যাসে অরুণেন্দ্রনাথও যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করলেন কিন্তু ফাঁপড়ে পড়লেন অবনীন্দ্রনাথ। কারণ

> আমার আর, যাকে বলে এসরাজের টিপ, সে টিপ আর দোরস্ত হয় না। আঙুলে কড়া পড়ে গেল, তার টেনে ধরে ধরে। বারে বারে চেষ্টা করছি টিপ দিতে, তার টেনে ধরে কান পেতে আছি কতক্ষণে ঠিক যে-সুরটি দরকার সেইটি বেরিয়ে আসবে, হঠাৎ এক সময়ে অ্যাঁ-ও করে শব্দ বেরিয়ে এল। ওস্তাদ হেসে বলত, হ্যাঁ, এইবারে হল। আবার ঠিক না হলে মাঝে মাঝে ছড়ের বাড়ি পড়ত আমার আঙুলে। [৭]

এভাবেই কাটল বেশ কিছু দিন। ধীরে ধীরে হাত গেল খুলে—সুর ধরায় আর বাধা থাকল না, আর টিপ হয়ে গেল সঠিক। গুরুও শিষ্যের প্রতি খুব খুশি। তবে আর অবনীন্দ্রনাথের প্রাঞ্জল ভাষায় এই খুশির আরেকটি কারণ

বড়োলোকের ছেলে, মাঝে মাঝে পেন্নামি দেই, একটু ভক্তিটক্তি দেখাই — এমন শাগরেদের উপর নজর তো একটু থাকবেই। [৮]

এস্রাজ বাজানোটা এতটাই তাকে পেয়ে বসল যে রোজ সন্ধ্যা হলেই দক্ষিণের বারান্দায় আলসেমির সাথে সঙ্গীতচর্যা শুরু করলেন। সাহচর্য পেলেন মতিবাবু, শ্যামসুন্দর, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর। সুরের চর্চায় এস্রাজের সাথে শুরু করলেন আরেক নতুন বাদ্যযন্ত্র — ম্যান্ডোলিন। সুরের আড্ডায় মতিবাবু গাইতেন শিবের বিয়ের পাঁচালী গান,

> তোরা কেউ যাসনে ওলো ধরতে কুলো কুলবালা,
> মহেশের ভূতের হাটে এসব ঠাটে সন্ধ্যেবেলা।
> যেরূপ ধরেছিস তোরা, চিত-উন্মত্ত-করা,
> চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা। [৯]

১৮৮৫ সালের সময়ে শুরু হল 'খামখেয়ালি সভা'। গীত-বাদ্যের পাশাপাশি কাব্য ও সাহিত্যচর্চার আরেক আনন্দ ঘিরে ধরল অবনীন্দ্রনাথকে। কে নেই সে সভায় — রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লোকেন পালিত, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ। সেখানেই ১৮৮৬ সালে এলেন

সর্বকনিষ্ঠ ও অবনীন্দ্রের সমবয়সী সভ্য অতুলপ্রসাদ সেন। রবীন্দ্রসংগীত গান তো ছিলই সেই সাথে ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান – তাতে দোয়ার বা কোরাসের দলে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নতুন সুরের গানে পাশাপাশি অতুলপ্রসাদের ব্রহ্মসংগীত। অবনীন্দ্রনাথ তখন তাঁর এস্রাজের সঙ্গতে ভরিয়ে রাখতেন সে সভা। রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রলালের নতুন গানে মিশে যেত প্রাচীন সুর, রূপ পেত নবতর সৃষ্টি। অন্যদিকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, মা সৌদামিনী দেবীর ইচ্ছাতেও বসত গানের আসর। যেমন, 'ভুবনবাই' আসতেন 'বউদের গান' শোনাতে। এককালে যখন তাঁর অল্প বয়স ছিল সেই সময়ে আমলে সখীসংবাদ, মাথুর ইত্যাদি পালা-কীর্তন গাইতেন। অবন ঠাকুর বলেছেন,

> ফোঁকলা দাতে তোতলা তোতলা সুরে সে এই গান গেয়ে মরেছে। কিন্তু সেই বুড়ি যেটুকখানি ধরে গেছে আমার মনে, সেই বস্তুটুকুও যে আমার কৃষ্ণলীলার কোনো ছবিতে নেই তা মনে কোরো না। [১০]

লক্ষ্ণৌয়ের খুব নামকরা বাইজী 'নান্নীবাই'-এর গান ছিল তাঁর খুব প্রিয়। গুণেন্দ্রনাথের সময়ে আরেকজন গান গাইতেন 'শ্রীজান'। তিনিও সারারাত-ব্যাপী জলসায় সেই বৈকুণ্ঠখানায় গান করেছিলেন বুড়ো বয়সে। কানাড়া আর ভৈরবী রাগে শ্রীজান ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাঁর কোকিলকণ্ঠ শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে দিত। অবনীন্দ্রনাথ তখন সংগীতের চর্চা এমন দস্তুরভাবে করতেন যে কোন্ 'গাইয়ে-বাজিয়ে এল গেল সব খবর' তাঁর কাছেই পাওয়া যেত। কাশীর সরস্বতীর গান আর নাটোর মহারাজের মৃদঙ্গ সঙ্গতে নাচঘর মুখরিত থেকেছে। বিখ্যাত ভজন 'আও তো ব্রজচন্দলাল' গানটিও তিনি গেয়েছিলেন। আবার নাটোর-মহারাজের ছেলের বিয়েতে কর্ণাট থেকে এসেছিলেন নৃত্যবিশারদ একটি মেয়ে সঙ্গে তাঁর 'দিদিমা'। এঁর নাম তিনি জানাননি তবে তিনি যে কলাবিদ্ 'কালকাবিন্দের শিষ্যা' ছিলেন সেটি উল্লেখ করেছেন। মেয়েটির অপূর্ব নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে, অবনীন্দ্রনাথের শখ হল দিদিমার নাচ দেখেন। প্রস্তাব শুনে নাটোর-রাজ হতবাক্ — এ কী ভাবান্তর অবনীন্দ্রনাথের! কিছু সময় পরে সেই বুড়ি দিদিমা নাতনির 'পাঁয়জোর পরে উড়নিটি গায়ে জড়িয়ে' সারেঙ্গীর সুরে ধরলেন নাচ। নৃত্য-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ পরিবেশনায় সকলেই আবার বাক্যহারা হলেন। শুধু বহুবছর পরে রাণী চন্দকে সেই নৃত্য পরিবেশনার কথায় বলেছেন,

> এমনভাবে মাটিতে পা ফেলল, মনে হল, যেন কার্পেট ছেড়ে দু-তিন

আঙুল উপরে হাওয়াতে পা ভেসে চলেছে তার। অদ্ভুত পায়ে চলার কায়দা; আর কী কী গতি, জলের উপর দিয়ে হাঁটল কি হাওয়ার উপর দিয়ে বোঝা দায়। বুড়ির বুড়ো মুখ ভুলে গেলুম, নৃত্যের সৌন্দর্য তাকে সুন্দরী করে দেখালে। [১১]

কোনো বিশেষ ধারা নয় বরং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবন জুড়েই ছিল সংগীতের নির্ঝরিণী। তাই তো শুধু নৃত্যশিল্পী নন, মাদ্রাজ থেকে একবার এক বীণকারকেও নিয়ে আসেন অবনীন্দ্রনাথ। শাস্ত্রীয় সংগীতের আরও দুই অনুরাগী ব্লান্ট সাহেব, স্যর জন উড্‌রফ সাহেব [প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ও বিশিষ্ট সংগীত রসিক]-ও ছিলেন সেই শ্রোতাদের দলে। প্রতি সপ্তাহে রাত্রি নটার পরে বসত সুরের আলাপ। কখনো কখনো জার্মান দার্শনিক কাইজারলিংও উপস্থিত থেকেছেন এই সুরবিতানে।

সংগীত চর্চার এই নেশায় যখন তিনি মশগুল, তার সাথে 'খামখেয়ালি'র আনন্দ তাকে আরও গুরুদেবের কাছাকাছি এনে দিল। সে সময় কলকাতায় প্লেগ মহামারির রূপ নিয়েছে। তেতলার বাড়ি ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ চৌরঙ্গীর ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। পরে মহামারির প্রকোপ কমলে পুনরায় ফিরে আসেন জোড়াসাঁকোয়। এবার শুরু হল সেই নাচঘরে ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির কণ্ঠে কথকতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'পরগণা' থেকে ফিরে এসেই বললেন,

শিবু কীর্তনিয়াকে এনে গান শোনাও। ছোট বউঠানের ভালো লাগবে, তোমাদেরও ভালো লাগবে, ওরকম আমি আর শুনিনি। [১২]

শিবু কীর্ত্তনীয়া আসার ফলে যা ঘটল তা হল 'কথকের ছুটি হয়ে গেল'। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, 'রবিবাবু এসে আমার জমাট আসরটা ভেঙে দিলেন'। [১৩]

তবে গঙ্গাবক্ষে ঠাকুরবাড়ির সংগীত শ্রবণের যে পুরাতন আনন্দটি ছিল তা অবন ঠাকুরের হস্তক্ষেপে নতুন রূপ পেল। চিকিৎসকের নির্দেশে যারা রুগী তাদের গঙ্গার হাওয়া খেতে হত। তাই সেই গঙ্গার হাওয়ার সাথে সংগীতের অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের কথা মনে রেখে শুরু হল নদীবক্ষে গান-বাজনা। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বোস মহাশয় তাদের মধ্যে অন্যতম যিনি খুব ভালো বাঁয়া-তবলা বাজাতে জানতেন অথচ তিনি কানে শুনতে পেতেন না। শুধু গায়কের মুখ দেখেই বুঝে যেতেন ছন্দ কেমন হবে। এককথায় তিনি ছিলেন 'অক্ষিশ্রবা'। এই সমস্ত অধিবেশনে নিয়মিত চর্চা হত নিধুবাবুর টপ্পা, গোপাল উড়ের যাত্রা-গান ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে এস্রাজে অবনীন্দ্রনাথ পাকা হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু গৎ-

এর বাইরে নতুন সুর বাজানোর ক্ষমতা থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। ফলে যা হল, বাঁধা সুর আর মনে ঠেকে না আর মনের আনন্দ পাওয়া যায় এমন সুর মনের মাধুরী মিশিয়ে বাঁধতে পারেন না। তাই কালোয়াতির দিকটা দিলেন ছেড়ে কিন্তু গুরুদেবের নতুন গানের সঙ্গী হয়ে গেলেন তিনি ও তাঁর এস্রাজ,

এ দিকে রবিকাকা গান লিখলেন নতুন নতুন, তাতে তখুনি সুর বসাচ্ছেন, আর আমি এস্রাজের সুর ধরছি। দিনুরা তখন সব ছোটো — 'গানে নতুন সুর দিলে আমারই ডাক পড়ত'। [১৪]

কিন্তু সুর যে মনে রাখতে হবে এবং সেটা যে খুব খেয়াল রেখেই করতে হবে বুঝতে পারেননি। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ গানের সুর জানতে চাইলেন ততক্ষণে সুর তো তিনি বেমালুম ভুলে বসে আছেন। পড়লেন মহা বিপদে। কান তৈরি হয়েছে, হাত সুরে সুরেই যায়। এমনকি যা শোনেন তাই বাজাতে পারেন কিন্তু সুর মনে রাখতে পারেন না। অন্যদিকে গুরুদেবও সুর দিয়ে ভুলে যান, সুতরাং,

> রবিকাকাকে বললুম, কী যেন সুরটি ছিল একটু একটু মনে আসছে। রবিকাকা বললেন, বেশ করেছ, তুমিও ভুলেছ আমিও ভুলেছি। আবার আমাকে নতুন করে খাটাবে দেখছি। [১৫]

তারপর থেকে এস্রাজের উপর অঙ্গুলি-চালনে গানের সুরকে ধরে রাখতে আর অসুবিধা হয়নি। জীবনে এই একটিই মাত্র গানের সুর অবনীন্দ্রনাথের কারণে হারিয়ে গিয়েছিল। সে জন্য চিরকাল বুকে সেই হারানোর ব্যথাটি বয়েছেন। মহর্ষি-ভবনের একতলার বড়ো ঘর প্রায় প্রতিদিনই গুরুদেবের গানে মুখরিত হত। এস্রাজে অবনীন্দ্রনাথ, পাখোয়াজে নাটোরের মহারাজ। সময়ের জ্ঞান থাকতো না তাঁদের। কখন যে নিশীথিনী দিনের পারাবারে মিলে যেত, জানা যেত না। তাঁর ইচ্ছা হত গুরুদেবের গানগুলি করেন কিন্তু গলায় সুর আসত না। শেষে গুরুদেবকে বলেই বসলেন

> আমার সুরে যদি তোমার গান গাই, তোমার তাতে আপত্তি আছে? রবিকাকা বললেন, না, তা তার আপত্তি কী। তবে দেখো গানগুলো আমি লিখেছিলেম, সুরগুলোও দিয়েছি, সেগুলির উপর আমার মমতা আছে, তা নেহাত গাওই যদি তবে তার উপর একটু মায়া দয়া রেখে গেয়ো। [১৬]

গুরুদেবের গান একক-কণ্ঠে না গাওয়া হলেও পরে নাটকে গান গেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনীত হয়

যেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। 'ব্রজদুর্লভ' চরিত্রে নামলেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু গলায় তো সুর নেই, কি করবেন। 'রবিকাকা'-কে ধরলেন উদ্ধার করার জন্য। শেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন — 'তুমি নিজেই যা হয় একটা গাও'। শেষে উপায় বের করলেন। রাধানাথ দত্ত নামের একজন সন্ধ্যা হলেই ঠাকুরবাড়ির পাড়ায় নেশায় বুঁদ হয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ানো গলায় একটা গান গাইতেন। অবনীন্দ্রনাথ হুবহু তাঁর নকল করে ছড়ির বদলে মাথার চাদর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মঞ্চে ঢুকেই গাইলেন,

আয় কে তোরা যাবি লো সই
আনতে বারি সরোবরে। [১৭]

ব্যস, এইটুকু গাইতেই চারদিক থেকে হাততালি শুরু আর দর্শকাসনে বসে থাকা 'রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর'। কিন্তু এর ফল হল ভয়ানক। এই রাধাবাবুই অবন ঠাকুরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রটালেন 'ছেলেরা সব বুড়োদের নকল করে তামাশা করেছে'।

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, বাল্মিকী প্রতিভা, শারদোৎসব, ফাল্গুনী, ডাকঘর, তপতী, নটীর পূজা নাটকেও নানা ভাবে যুক্ত থেকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। অভিনেতা, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, বিভিন্নদৃশ্যের নেপথ্য চিত্র-শিল্পী কিছু-না কিছুতে তিনি থাকতেনই। সেই সাথে কাণ্ডকারখানা-ও ঘটাতেন। একবার ফাল্গুনী নাটকে পিয়ার্সন সাহেবের পাশাপাশি দলের অভিনয়ে নামিয়ে ছিলেন এক মেমসাহেবকে, যিনি সুদূর প্যালেস্টাইন থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ছোটদের পড়াতে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে তিনি হয়েছিলেন 'শ্রুতিভূষণ' চরিত্রটি। নাটকের শেষ গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। নানা রঙের আলোয় সমবেত হুল্লোড়। সেখানেই তিনি ঘটালেন কাণ্ড। তিনি বলেছেন,

> আমি ছোট ছোট ছেলেগুলোকে কোলে নিয়ে পুঁথিপত্র নস্যির ডিবে হাতে, নামাবলী ঘুরিয়ে নাচতে লাগলুম। মেমসাহেবও নাচছে। রবিকাকার ভয়ে সে বেচারী দেখি স্টেজের সামনে আসছে না, সবার পিছনে পিছনে থাকছে। আমি তার কাছে গিয়ে এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে স্টেজের সামনে এনে তিন পাক ঘুরিয়ে দিলুম ছেড়ে, মেমসাহেবের কোমর ধরে বল্ নাচ নেচে। অডিয়েন্সের হো হো শব্দের মধ্যে ড্রপসিন পড়ল। [১৮]

শুধু নাটকেই নয়, কালের নিয়মে তাঁর জীবনের রঙ্গমঞ্চের নানা দৃশ্যেও ড্রপসিন পড়তে শুরু করেছিল। এস্রাজ বাজানো বন্ধ হল। শ্যামসুন্দর

চলে গেলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের কাজে অনেক আগেই যোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হয়ে এল দক্ষিণের বারান্দা। একে একে চলে গেলেন যারা ছিলেন কাছে। সবচেয়ে প্রিয় 'রবিকা'-ও এক বাইশে-শ্রাবণে অমৃতধামে গেলেন। স্মৃতিগুলো বুকে রেখে আর কখনো কখনো নিভৃতে এস্রাজে গুরুদেবের গানের সুর টেনে সংগীতমুখর অবনীন্দ্রনাথও চলে এলেন জীবনের শেষপ্রান্তে। শুধু এতটুকুই আক্ষেপ রয়ে যায় এইভেবে যে, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্পীর পরিচয়টা এতদিন ধরে অনালোচিত থেকে গেল। আজ সার্ধ-শতবর্ষের শুভলগ্নে সংগীতরসিক শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে জানাই শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি।

সূত্র-নির্দেশ

১। 'জোড়াসাঁকোর ধারে', শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শ্রীরাণী চন্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক, ১৩৫১, পৃ. ১২।
২। তদেব, পৃ. ১৪।
৩। তদেব, পৃ. ২৫।
৪। তদেব, পৃ. ২৫-২৬।
৫। তদেব, পৃ. ৩৩।
৬। তদেব।
৭। 'ঘরোয়া', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শ্রীরাণী চন্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮, কলিকাতা, পৃ. ১৮।
৮। তদেব, পৃ. ১৯।
৯। 'জোড়াসাঁকোর ধারে', পৃ. ৫২।
১০। তদেব।
১১। তদেব, পৃ. ৫৪।
১২। তদেব, পৃ. ৬৪।
১৩। তদেব।
১৪। 'ঘরোয়া', পৃ. ২০।
১৫। তদেব, পৃ. ২১।
১৬। তদেব।
১৭। তদেব, পৃ. ১০৩।
১৮। তদেব, পৃ. ১৩৬।